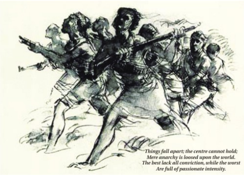

স্বাধীনতার স্মৃতি-শেষ খণ্ড

আমি বিজয় দেখেছি

আতিক রহমান

ডিসেম্বর ১৯৭১ দেশ স্বাধীন হলো আর আমিও পাকাপাকি মুসলমান হলাম। আমার মুসলমান হওয়াটা যেন ঝুলে ছিলো দেশ স্বাধীন হবার জন্য। সাধারণত শীতকালে আমাদের দেশে ছেলেদের মুসলমান হবার কাজটা সাড়া হয়, কিন্তু ১৯৬৯ এ আমার বাঁচি কি মরি এক ভয়ানক অসুখ, ১৯৭০ এর নভে: মহাপ্লাবন, আর ১৯৭১ এর স্বাধীনতার যুদ্ধ- এ সব মিলিয়ে আমার পাকাপাকি মুসলমান হওয়াটা বেশ কয়েক বছর পিছিয়ে যায়। আর তাই আমার মায়ের ঘটা করে আমার মুসলমান হওয়ার অনুষ্ঠান করার সাধটা অসম্পূর্ণই থেকে যায়।

৯ই ডিসেম্বর ১৯৭১, আমাদের মহকুমার ছোট্ট শহর স্বাধীন হলো। পাকিরা চলে গেল, মুক্তিযোদ্ধারা পুরো শহর দখল করলো। আমার যে মামাত ভাই পাক আর্মিতে ছিলেন সে তার পুরো বাহিনী নিয়ে শহরে ঢুকে পড়লেন, সাথে তার জ্যান্ত দশ পাকসেনা। এই পাকসেনারা অন্য জেলা থেকে যুদ্ধে হেরে নৌকা যোগে পলায়নের সময় পথ হারিয়ে বেকায়দায় পড়ে মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। বন্দী পাকসেনাদের স্থানীয় টাউন হলে রাখা হলো। সকাল বিকাল ওদের টাউন হলের সামনের মাঠে বাঙালীদের সামনে প্যারেড করানো হতো, আর জয় বাংলার শ্লোগান দিতে বলা হতো। ওরা জয় বাংলা বলতে পারতো না, বলতো জে বাংলা, জে বঙ্গবন্ধু। আমার মামাত ভাই মুক্তি বাহিনীর কমান্ডার হওয়ার সুবাদে আমি ওদের খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। ওদের সবারই বয়স মোটামুটি বিশের কোঠায়, ওদের দেখে কখনই মনে হয়নি ওরা ওদের জীবনের ভয়ে এতটুকু ভীত। বেশ হাসিখুশি রংতামাশায় সময় কাটাতো ওরা। ইতিমধ্যে ইন্ডিয়ান শিখ সেনারাও ঠুকে পড়লো শহরে। অচিরেই ঐ বন্দী পাকসেনাদের ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। আর তার পরের খবরতো সবারই জানা।

শহরের আরেক প্রান্তে স্থানীয় টাউন স্কুলের মধ্যে আটক রাখা হলো রাজাকার কমান্ডার আবি মৌলবি, সদর গার্লস স্কুলের বয়স্কা শিক্ষিকা রাজাকার সাধনা রায়, মিলিটারিদের জীপ চালক রাজাকার দুলাল ড্রাইভার, মোহাম্মদ টনিসহ আরো কয়েক জন কুখ্যাত রাজাকারকে। আবি মৌলবির বড় বড় গোঁপ ছিল। মুক্তি বাহিনী ঐ গোঁপ ধরে টেনে জন সমুখে আবি মৌলবিকে দিয়ে সোনার বাংলা'র গান গাওয়াতো। এভাবে চললো কিছুকাল, তারপর এদের পাঠিয়ে দেয়া হলো মহকুমার একমাত্র জেলখানায়। একমাত্র মোহাম্মদ টনি ছাড়া এভাবেই প্রাণে বেঁচে যায় এসব ভয়ানক কুখ্যাত রাজাকারগুলো। মোহাম্মদ টনিকে এক বিকেলে স্থানীয় স্কুলের মাঠে জনসম্মুখে হাজির করা হয়। ওখানে জনগণের রায়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং তারই দু'একদিন পর এক সকালে সেই দণ্ড কার্যকর করা হয় ।

১৯৭১ ডিসেম্বর মাস প্রায় শেষ। হঠাৎ পাড়ার বড়দের মুখে জানতে পারলাম আমেরিকার সপ্তম নৌবহর নাকি ভারত মহাসাগরের উপকুল দিয়ে যে কোন সময়ে বঙ্গোপসাগর ঠুকে পড়বে এবং আমাদের মহকুমা দিয়েই নাকি দেশ আক্রমণ করবে। বড়দের রাজনীতির আলোচনার মাধ্যমে এটা আমার জানা হয়ে গিয়েছিল যে যুদ্ধের আগাগোড়া আমেরিকা সরকার আমাদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। ইন্ডিয়া রাশিয়া আমাদের পক্ষে, আর আমেরিকা পাকিদের পক্ষে। ভেবে অবাক হলাম যে যুদ্ধ শেষ

হয়েও হয়নি শেষ। পাড়ার মুসলিম লীগ খালু-জানের এক ছেলে বয়সে আমার বেশ বড় নাহিদ ভাই জানালেন সামনে ভয়ানক যুদ্ধ আসছে। ভাবতে বড় কষ্ট হচ্ছিল যে পাকিস্তান নামক দেশটির শাসকগোষ্ঠী আমাদের মাথার উপর জগদ্দল পাথরের মতো আরও বসে থাকবে, এ কিছুতেই ভাবা যায় না। কিন্তু না ভয়ানক সেই যুদ্ধের ভীতি বেশীক্ষণ থাকলো না। অচিরেই শুনলাম রাশিয়ার নৌ বাহিনীর বিশাল ফ্রিগেটও নাকি আমাদের উপকুলের দিকে ধেয়ে আসছে। তারই ফলশ্রুতিতে আমেরিকার সপ্তম নৌবহর আস্তে আমাদের উপকুল থেকে কেটে পড়েছে। আর আমরা অবশেষে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

পাকবাহিনী চলে যাবার পর পরই শত শত মুক্তিবাহিনী মহকুমা শহরে ফিরেতে শুরু করলো। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল আমাদের নিকট আত্মীয়। বাবা আমাদের বাসার দালানের সামনের দিকের একটা রুম ঐসব আত্মীয় মুক্তিযোদ্ধাদের থাকার জন্য ছেড়ে দিলেন । এরা রাতে এসে আমাদের বাসায় ঘুমতো আর সকালে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে চলে যেতো। কলেজের ভিপি সালেহ ভাইসহ বহু ছাত্রনেতা মুক্তিযোদ্ধারা যারা আগে সচরাচর আমাদের বাসার বৈঠকখানার রাজনীতির আড্ডায় আসতেন তারা শহরে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত মুজিব বাহিনীও ঢুকে পড়লো শহরে। মুজিব বাহিনীর সবার হাতে এস এল আর, নূতন নূতন সাজ পোশাকে সজ্জিত হয়ে পিক আপ ভ্যানে তারা শহর টহল দিতো । মুজিব বাহিনী ছিল দু'গ্রুপে বিভক্ত। এক প্রান্তে চৌধুরী গ্রুপ আর অন্য প্রান্তে শশী গ্রুপ। কলেজের প্রাক্তন ভিপি সালেহ ভাই আমার মেঝো ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি অন্তত ভদ্র ও শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। একদিন দুপুরে সালেহ ভাই ও সাইফুল্লাহ ভাই আসলেন আমাদের বাসায়। সাইফুল্লাহ ভাইয়ের কাঁধে ঝোলান রাইফেল, মাথা কান উলের কান-টুপিতে ঢাকা। সাইফুল্লাহ ভাইয়ের ছিল হাস্কি গলা। সেই ছিল এদের সাথে আমাদের শেষ দেখা। কি হয়েছিল জানিনা, ১৯৭২'র জানুয়ারির মাঝামাঝি দেশ স্বাধীন হবার মাত্র এক মাসের মাথায় সাইফুল্লাহ ও জুলু ভাই সহ সালেহ ভাইকে কে বা কারা রাতের আঁধারে হত্যা করে লাশ শহর থেকে ২০/২৫ কিমি: দূরে নদীর ধারে ফেলে রেখে দিয়েছিলো।

হানাদার নরপশুরা যখন এইসব অদম্য সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করতে পারেনি, শেষে কিনা সেইসব সাহসী বীরদের প্রাণ দিতে হলো দেশ স্বাধীন হবার পরে, তাও আবার তাদেরই সহযোদ্ধাদের হাতে। বড় বেদনা দায়ক। এর কিছুদিনের মধ্যে একই স্টাইলে হত্যা করা হলো মহকুমা শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক সুফি হাবিবুর রহমান সাহেবের দুই পুত্র, দুর্দান্ত মুক্তিযোদ্ধা রহমান ও সিদ্দিক ভাইকে। শুনেছি রহমান ভাই ছিলেন পাক আর্মির বিমান বাহিনীতে। দেশের জন্য চাকুরীর মায়া ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। জনশ্রুতি আছে সালেহ ভাইসহ এ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের অকাল প্রাণ নাশের পিছনে তৎকালীন মহকুমা শহরের ক্ষমতা দখলের লড়াই এবং মুক্তিবাহিনীর দুই গ্রুপের আত্ম-কোন্দলই দায়ী। এ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্ম ত্যাগের কথা মহকুমা শহরের সাধারণ মানুষের মনে জাগরূক হয়ে থাকবে চিরকাল। এসকল মুক্তিযোদ্ধারা কেউ ভারতে যাননি। একটি পিস্তল আর গুটি কয়েক গাঁদা বন্দুক নিয়ে মহকুমা শহরের ভিতরে থেকেই এরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন পাক বাহিনীর মতো একটি প্রশিক্ষিত রেগুলার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। জানিনা কি অপরাধ ছিল তাদের, কেনইবা দেশ স্বাধীন হবার একমাসের মাথায় এই অকুতোভয় বীরদের এভাবে প্রাণ দিতে হলো। এটা সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারেনি। আর সেই থেকেই শুরু হয় মহকুমা শহরের রাজনীতির কাউতাল। আর এইসব কাউতালের কারণে আজ অবধি এসকল হত্যা কাণ্ডের বিচার হয়নি, আর হবেও না হয়তো কোনদিন।

১৯৭২ জানুয়ারি মাস। ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এলেন। সে কি বিশাল আনন্দ আমাদের পাড়ার প্রতিটি ঘরে ঘরে। পাড়ায় তখন কোন বাসায় টিভি ছিলো না। বিবিসি, আকাশবাণী আর বেতার বাংলার উপরই ভরসা। সবাই উৎফুল্ল চিত্তে এসব নিয়ে আলোচনা করেছিল। আর আমরা ছোটরা বড়দের আনন্দের সাথে কিছু বুঝে কিছু না বুঝে সেই আনন্দ ভাগাভাগি করছি। কিছুদিনের মধ্যে স্কুল খুললো, আমরা আবার যথারীতি স্কুলে ফিরে গেলাম। ঢিমাতালে ক্লাস শুরু হলো। আবার আমরা স্কুলের পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলা স্কাউটিং ইত্যাদি শুরু করলাম। আমাদের পি আই [ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টরর] স্যার ছিলেন ভীষণ রসিক মানুষ এবং সবার ভাল লাগার মত এক ব্যক্তিত্ব। স্যার আমাদের ব্যান্ড প্রাকটিস এবং লেফট রাইট করানো শুরু করে দিলেন। মোস্তাফা ভাই ছিলেন স্কাউট লিডার, উনি তখন স্কুলের পাঠ শেষ দিয়ে কলেজে যাবেন এমন ভাব। আমরা প্রাইমারীর ছাত্ররা ছিলাম কাব [শিশু স্কাউট] এবং আমি ছিলাম সবুজ কাবদের দলনেতা আর বন্ধু নুরু ছিলো লাল দলের।

শুনলাম অচিরেই বঙ্গবন্ধু আমাদের মহকুমায় আসবেন এবং আমাদের স্কাউটদের বঙ্গবন্ধুকে সম্বর্ধনা দিতে হবে। পি আই স্যার আমাদের খবরটা জানালেন। আমরা মহাখুশী। জোর কদমে প্রস্তুতি নিলাম এবং বঙ্গবন্ধু আসার প্রায় দুদিন আগে আমরা শহর থেকে পঁচিশ ত্রিশ মাইল দূরে ১৯৭০ প্রলয়ংকরী মহাপ্লাবনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত যেই থানা সেই থানায় তাঁবু খাঁটিয়ে বঙ্গবন্ধুকে সম্বর্ধনা জানানোর অপেক্ষায় থাকলাম। একটা পিকনিক পিকনিক ভাব, বাবা মা ছাড়া প্রথম বাসার বাইরে রাত্রিযাপন। একটা মিশ্র অনুভূতি নিয়ে বঙ্গবন্ধু আসার অপেক্ষায় আছি। অবশেষে বঙ্গবন্ধু এলেন। এত মানুষ একসাথে আমি এর আগে কখনও দেখিনি।

এটাই বঙ্গবন্ধুর দেশে ফিরে ঢাকার বাইরে প্রথম সফর । বঙ্গবন্ধু আসলেন বন্যা প্রতিরোধে বেড়িবাঁধ [যা কিনা লেভী নামে পরিচিত] নির্মাণের এক বিশাল প্রকল্পের উদ্বোধন করার জন্য। পুরো মহকুমা যেন আনন্দের প্লাবনে ভাসছিল। এটাই ছিলো স্বাধীন দেশের প্রথম বড় রকমের ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প। জাপানী অনুদানে প্রায় ৫০ মাইল লম্বা প্রলয়ংকরী মেঘনার উপকুল ঘেঁষে লেভী নির্মাণ করে মেঘনা পাড়ের মানুষ বাঁচাবার প্রকল্প। এতে আরেকবার প্রমাণিত হয় বঙ্গবন্ধু যে কত বিশাল মাপের লোক ছিলেন যে কিনা দেশ স্বাধীন হওয়ার অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে বন্যা দুর্গত সাধারণ মানুষের জন্য কত বড় একটা বিশাল প্রকল্পের কাজে হাত দিয়ে ছিলেন। যথারীতি বঙ্গবন্ধু এলেন। আমাদের সম্বর্ধনা গ্রহণ করলেন এবং আমাদের মাঝ দিয়ে উনি যখন হেঁটে গেলেন, আমার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে গেলেন। সেই শিশু বয়সে এই বিশাল নেতাকে এক পলক দেখার যে স্মৃতি আমার মনের কোনায় যে দাগ কেটেছে সে দাগ কোনদিন ঘুচে যাবে বলে মনে হয় না। বঙ্গবন্ধু ছিলেন স্বাভাবিক বাঙ্গালী সাইজের চেয়ে অনেক লম্বা, ঘাড় পুরোপুরি বাকিয়ে তার মুখখানা আমাকে দেখতে হয়েছে।

ঠিক এর কিছুকাল পরেই গ্রীষ্মের মাঝামাঝি তৎকালীন মুজিব সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান এলেন আমাদের শহরে। মাননীয় মন্ত্রী রেস্ট হাউজে উঠলেন। এই সেই রেস্ট হাউজ যেখানে পাক মিলিটারির মেজর থাকতো, আর শহরের অনিন্দ্য সুন্দরী কমল ব্যানার্জীকে মাসের পর মাস আটকে রেখে তার সেবা গ্রহণ করতো। পাকিরা চলে যাবার পর ওদের কুকীর্তির অনেক আলামত সাফ করে এখন এটাকে মান্যগন্য ব্যক্তিবর্গের ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে। আমার মা আমাকে বললেন মন্ত্রীর সাথে দেখা করতে। আমি জানিনা মাকে এ বুদ্ধি কে দিয়েছিলো। এর কারণ একটু বিস্তৃত। আমার মায়ের কাছে পাকিস্তানি অচল তিনখানি একশত টাকার নোট ছিলো। পাকিস্তান সরকার যুদ্ধ চলাকালীন একটা সময়ে একশত টাকার সকল নোট অচল ঘোষণা করেছিলো এবং

ব্যাংকে জমা দিতে বলেছিলো। আবার একই সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে এই টাকা পাকিদের কাছে জমা দিতে বারণ করেছিলো। আরও বলে ছিলো এই টাকা জমা দিলে ঐ টাকা দিয়ে নাকি পাকিস্তান সরকার বাঙ্গালী নিধনের জন্য আরও অস্ত্র কেনার সুযোগ পাবে। এবং বলেছিলো দেশ স্বাধীন হলে এ অচল নোট স্বাধীন দেশের সরকার চালিয়ে নেবে। আমার মা সেই সরল বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এই টাকা আর ব্যাংকে জমা দেননি। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পড়ে এই টাকা তো আর চলেনা। এনিয়ে আমার মায়ের মনে বড় ক্ষোভ ছিল। টাকাগুলোর বেশীর ভাগই ছিল মায়ের কাছে রাখা আমার প্রাইমারীর বৃত্তির জমানো টাকা।

আমি দুপুরের খাবারের পর মায়ের কথামত তিনখানি পাকিস্তানী অচল ১০০ শত টাকার নোট সাবধানে পকেটে পুড়ে রেস্ট হাউজের বারান্দায় হাজির হলাম। আমি আগেই বলেছি রেস্ট হাউজটি ছিল আমাদের বাসার কাছেই, পায়ে হাঁটা পথের দূরত্বে। তখনকার দিনে মন্ত্রীদের এখনকার দিনের মত এত পাহারাদার এত প্রোটকল ছিল না। একজন পুলিশ রেস্ট হাউজের ঢোকার পথে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে ছিলো। আমাকে কিছুই বলেনি। আমি সহজেই মন্ত্রীর রুমের কাছাকাছি চলে গেলাম। দেখলাম মন্ত্রী মহোদয় দুপুরের খাবারের পর বিছানায় হেলান দিয়ে পেপার পড়ছেন। তার পাশে ছোট্ট একটি মেয়ে বয়সে আমার কাছাকাছি বিছানায় বসে কি নিয়ে যেন খেলছে। মন্ত্রী মহোদয় আমাকে দেখে ফেললেন এবং আমাকে কাছে ডেকে তার একদম কাছে বিছানায় বসালেন। আমার ভাবসাব দেখে উনি হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি কিছু একটা হয়ত বলতে এসেছি। আমি একটু ইতস্তত করছিলাম। উনি আমাকে আরো কাছে নিয়ে নির্ভয় দিয়ে আদরের সুরে বললেন, বলো তুমি কি বলতে চাও। আমি আস্তে পকেট থেকে আমার মায়ের দেয়া অচল পাকিস্তানী তিনখানি ১০০ শত টাকার নোট মন্ত্রী মহোদয়ের সামনে তুলে ধরলাম। এবং এর বৃত্তান্ত ওনাকে খুলে বললাম। উনি খুব আফসোস করলেন। উনি আমাকে রেখে উঠে পাশের রুমে গেলেন। আমি জানলাম ঐ ছোট্ট মেয়েটি মন্ত্রী মহোদয়েরই মেয়ে, বাপের সাথে আমাদের মহকুমা শহরে বেড়াতে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্ত্রী মহোদয় রুমে ফিরে এলেন, পিছু পিছু ওনার পিএস। উনি পি এস কে বললেন, আমার পুরো নাম ঠিকানা, স্কুল, ক্লাস, হেড মাস্টারের নাম ইত্যাদি বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করার জন্য। আর আমাকে বললেন, আমার স্কুলের হেড মাস্টারের কাছ থেকে আমি যে বৃত্তি পেয়েছি এবং এখনো যে সুবোধ বালক হয়ে স্কুলে লেখাপড়া করছি এ মর্মে একটা টেস্টিমোনিয়াল নিয়ে আবার দুদিন পড় ওনার সাথে দেখা করতে। উনি বললেন উনি দু'দিনের জন্য মহকুমার দূরের বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত এক থানার ত্রাণ তৎপরতা পর্যবেক্ষণের জন্য যাবেন। আমি যেন ইতিমধ্যে হেড মাস্টারের লেখা সংগ্রহ করে ফেলি এবং তৃতীয় দিনের মাথায় কাগজসহ আবার উনার সাথে দেখা করি।

আমি বাসায় এসে মাকে সব বললাম। মা একটু আশ্বস্ত হলেন। ছোট আপা আমার মন্ত্রী দর্শনের বর্ণনা শুনে দু' একটা টিপ্পনী কাটলেন; মন্ত্রীর মেয়েটা দেখতে কেমন রে। মন্ত্রীর মেয়েটি দেখতে কেমন ছিলো তা মনে নেই। তবে শুনেছি সে নাকি এখন বর্তমান সরকারী দলের এম পি এবং মহিলা বিষয়ক পার্লামেন্টারি কমিটির লিডার। আমি হেড মাস্টার সিরাজ স্যারকে বললাম, স্যার সাথে সাথে এক পাতার একখানা টেস্টিমোনিয়াল লিখিয়ে সই সিল করে আমার হাতে দিলেন। আমি মন্ত্রী মহোদয়ের উপদেশ মতো সময়মত হাজির হলাম। উনি ঐ দিনই ঢাকায় ফিরবেন। আর তাই বহুলোক উনার চারপাশে। মন্ত্রী মহোদয় আমাকে দেখেই কাছে ডাকলেন, তার পিএসকে আমার কাগজ গুলো গুছিয়ে নিতে বললেন। আর সাথে সাথে তৎকালীন মহকুমার কর্ণধার এসডিও মাহাবুবুর রহমান সাহেবকে

আমার ব্যাপারটা বলে গেলেন। আমাকে বললেন উনি ঢাকায় গিয়ে আমার টাকার ব্যবস্থা করবেন, আমাকে বললেন আমি যেন মাস খানেক বাদে এসডিও সাহেবের সাথে দেখা করি। আর এভাবেই আমি ফিরে পাই আমার অচল হয়ে যাওয়া বৃত্তির তিনশত টাকা।

১৯৭২ গড়িয়ে ১৯৭৩, ১৯৭৩ গড়িয়ে ১৯৭৪ এ পড়লো। দেশের পরিস্থিতি ক্রমে অবনতির দিকে যাচ্ছে। সব কিছুর জন্য লাইন দিতে হয়। তেল চিনি সাবানসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশচুম্বি। আমাদের বাসার কাছেই খোলা হলো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের রেশনের দোকান। ঐ রেশনের দোকান থেকে তিব্বত টুথপেষ্ট, সাবানসহ সব জিনিস লাইন দিয়ে কিনতে হতো। চিনিতো এক রকম দুষ্প্রাপ্য আইটেম। আমাদের এক নিকট আত্মীয় ফুড অফিসে চাকুরী করতেন। বাবা মাঝে মাঝে ওনার বদৌলতে স্লিপ নিয়ে ডিলারের কাছ থেকে চার পাঁচ কিলো একসাথে কিনে আনতেন। লাল বাহিনী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নামে বিভিন্ন বাহিনী দেশ এবং মহকুমা ছেয়ে গেল।শু রু হলো অরাজকতা। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা ছিলো এক উঠতি যুবক রফিক। তাকে প্রায়শই দেখা যেতো রক্ষী বাহিনীর লিডার আলমের জীপ গাড়ীতে করে পুরো শহর ঘুরে বেড়াতে। কলেজে পরীক্ষার হলে সেই নেতাকে নকল করতে বাধা দেয়ায় সে ম্যাজিস্ট্রেটকে কষে চড় মেড়ে ছিলেন বলে শুনেছি। কিন্তু কিচ্ছু হয়নি তার, কারণ সে ছিল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা। মহকুমার আইন শৃঙ্খলা বলতে যা বোঝাতো তা ছিল শুধু এক দলের লেহন পোষণ। স্কুলে ইতিমধ্যে একটু উপরের ক্লাসে উঠলাম। শহরের এক বিশিষ্ট পরিবারের ছেলে ওবায়েদভাই আমাদের জাতীয় নেতার বিশেষ হাতা সরকারী স্কুলে এসে কয়েক দিন আমাদের মুজিব বাদ শিখালেন। লেনিনবাদ, মাওবাদ -এর মতো মুজিববাদ। কিচ্ছু বুঝিনি, এটা বুঝেছি দেশে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে। পাড়ায় বড় বড় ভাইয়েরা আর আপার যারা আগে দেশ নিয়ে বড় বড় স্বপ্নের কথা বলতেন তারা যেন কেমন চুপসে গেলেন। আমার মেঝভাই ডাকসাইটে ছাত্রনেতা তার মধ্যে একজন। তিনি এখন আর বাবার বকুনির জবাবে কোন কথা বলে না, একদম চুপ মেরে থাকে। পাড়ার মধ্যে হতাশার ছাপ, কেউ কেউ গা ঢাকা দিলো পাড়া থেকে। শুনেছি মাকছু ভাইসহ বেশ কয়েকজন নাকি সিরাজ শিকদারের পার্টিতে যোগ দিয়েছে। এদিকে শুরু হলো নানান রকমের হত্যা, গুপ্ত হত্যা। এমনকি তৎকালীন সরকার দলীয় দক্ষিণ অঞ্চলের এক এমপিকে এক সন্ধ্যায় তার বাসার সামনে গুলি করে হত্যা করে ফেললো কে বা কারা। সরকার আর্মি নামালে দেশে আইন শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারে। মহকুমার আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি ঘটেছিলো বটে, তবে তা ছিলো খুবই ক্ষণস্থায়ী। অতঃপর যেই খাড়া বড়ি থোড় - থোড় বড়ি খাড়া। তারপর ১৯৭৪ সাল, শুরু হলো সারা দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। মহকুমা শহরে খোলা হলো লংগরখানা। কত মানুষ যে সেই লংগরখানায় খাবারের জন্য লাইন দিতো তা অবিশ্বাস্য। সন্ধ্যায় একটু ভাতের মা'রের জন্য মানুষ বাসায় বাসায় ধরনা দিতো। এভাবেই চললো কিছুকাল। তারপর ১৯৭৫, ক্ষমতার বিরাট পটপরিবর্তন। সেই সাথে আমাদের পাড়ায় হয়ে গেল রাজনীতির বিশাল মেরুকরণ। যারা একসময় নৌকার জন্য জীবন দিতে ইতস্তত করতো না, তারাই কেউ হয়ে গেলো ধানের শীষ, কেউ বা জাসদ।

পাড়ার কে কেমন আছেন আজ? বাবা মা, খালাম্মা খালুজান, কাকা কাকীমা'রা কেউ আর বেচে নেই। সাগর ভাই মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে বাংলাদেশ আর্মিতে কমিশন্ড অফিসার হিসেবে যোগদিয়ে সম্প্রতি মেজর জেনারেল হয়ে অবসর নেন। আর তৎকালীন সময়ের মহকুমার ডাক সাঁইটে ছাত্রনেতাদের মধ্যে যারা আমাদের বাসার বৈঠকখানার রাজনীতির আড্ডায় রীতিমত আসতেন, তারমধ্যে কেউ উকিল,

কেউ ঠিকাদারি, কেউ ঢাকায় বাইং হাউজ নিয়ে ব্যস্ত, আর কেউবা স্রেফ জীবনে সায়াহ্নে এসে বাদবাকি জীবনের হিসেব নিকেশ কষে দিনতিপাত করছেন। আমার মেঝোভাই কিছুকাল ঠিকাদারি, কিছুকাল এটা ওটা ব্যবসা, অবশেষে ভাবীর স্কুলের শিক্ষকতা আর জমিজমার আয়ের উপর নির্ভর করে দু'সন্তানের নিয়ে সংসার ধর্ম করছেন। এই স্বাধীনতার স্মৃতিকথার অতি প্রিয় যে চরিত্রটি আমার ছোট্রা'পা একটা গার্লস স্কুলের শিক্ষকতা করে ছেলে সন্তান নিয়ে ভালই আছেন। আর আমি এক পরাজিত দেশ প্রেমিক দেশ মাতৃকা ছেড়ে প্রবাসে বসে পুরোবাড়ী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করে দেশের ভুঁকা-নাঙ্গা মানুষের জন্য কিছু করতে না পারার বেদনায় আহাজারি করছি। আমার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মামাত ভাই কর্নেল ওসমানীর জনতা পার্টির টিকেটে ইলেকশন করে হেরে গিয়ে রাজনীতি ছেড়ে এখন ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ভালই আছেন।

প্রিয়জনেষু পাঠক, আমার এই স্বাধীনতার স্মৃতি'র সকল পর্বের মুল ভূমিকায় যেই বাড়ীটি, সেটা আজ অনেকটাই ভুতরে বাড়ী, সেই দালানখানি আজ বসবাসের অযোগ্য। বাবা মা নেই, বাবা মারা যান আমি যখন ভার্সিটি জীবন সবে শুরু করি। মা ছিলেন আমার সব, সেও চলে গেলেন আমি প্রবাসে আসার এক বছরের মাথায়। বড়ভাই অবসরে যাবার পর পরই চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে। বড় ভাবী ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঢাকায়। ঐ ভূতরে বাড়ী সংস্কার করে আমাদের ভাইবোনদের সবার অনেক ভালবাসায় লালিত স্মৃতি আর আমার স্বাধীনতার স্মৃতি রক্ষার দায়িত্ব এখন আমার উপর। কারণ আমি একটা ধনী দেশের নাগরিক, পকেটে কি আছে সেটা কেউ পরোয়া করে না। আমার ইচ্ছের এতটুকু কমতি নেই, দোয়া করবেন পাঠক অনেক স্মৃতিতে ভরা ঐ বাড়ীখানি যেন দেশের মানুষের জন্য ভাল একটা কিছু করে এর যথার্থ মূল্যায়ন করে যেতে পারি-এই আমার একান্ত কামনা।

- শেষ -

`